সিলেটবাসীদের লজ্জাঃ *সাধ্য মোদের দিলা প্রভু, সাধ মোদের দিলা না?*

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

(উৎসর্গ- আমার শ্রদ্ধাভাজন কাজিন এ, আর, খাঁ মানিককে, যিনি লেখাটির ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছেন।)

কলকাতার কোন এক নাট্যকর্মী ঢাকাস্থ বেইলী রোডের থিয়েটারের করুণ আবস্থা দেখে বাংলাদেশী এক নাট্যকর্মীকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেছিলেনঃ *তোমরা এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে চড়ে (হোন্ডা সিভিক, পাজেরো জীপ) ভ্যাপসা গরমযুক্ত ভাংগাচুরা হলে নাটক করতে আস; আর আমরা আজ ও ট্রামে চড়ি ঠিকই, তবে নাটক করি এয়ারকন্ডিশন্ড যুক্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন হলে।*

পার্থক্য অন্য কিছুতে নয়; পার্থক্য কাদের কাছে কোন বিষয়টা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। গল্পটা সাম্প্রতিক কোন এক লেখায় পড়েছিলাম। সিলেটবাসীদের উদ্দেশ্য কিছু বলবার পুর্বে আমি কেন এটির অবতারনা করলাম, আমার প্রবন্ধটির শেষে তা পরিষ্কার হবে। বলাবাহুল্য, আমি নিজে ও সিলেটিদের একজন।

সম্প্রতি আমার মা বলতে গেলে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আমার কপাল ভালো - সময় মতো পদক্ষেপ নেয়াতে মা বেঁচে গেছেন। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে খুব কম রোগী মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আসেন। মানুষ মাত্রই মরণশীল। সে তো জানা কথা। আমার মাকে ও একদিন মরতে হবে। মরতে হবে আমাকে ও। কিন্তু মৃত্যুটি যদি ডাক্তার -ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের ত্রুটি -অবহেলার কারণে ঘটে থাকে অঢেল টাকা খরচ করার পর ও ; তখন বাধ্য হয়ে বলতে হয়ঃ বিধাতা, এমন দেশটি কেন আমার জন্মস্থান হিসেবে নির্ধারণ করলে? এবার আসল ঘটনা খুলে বলি ।

এই জুলাই (২০০৪) মাসের প্রথম দিকে আমার বৃদ্ধা মা বাথরুমে পড়ে গিয়ে উরুর হাড্ডির অগ্রভাগ ভেংগে ফেলেন। মার বয়স ষাটের কাছাকাছি এবং দীর্ঘ বিশ বছর থেকে ডায়বেটিস রোগে ভোগছেন। তাৎক্ষণিক অবস্থায় সিলেট শহরে এম, এ, গাফফার নামের একজন ডাক্তার সাহেব *(অর্থোপেডিশিয়ান)*কে দেখানো হলো। তিনি পরামর্শ দিলেন- তিন মাসের মতো বিছানায় রেস্ট নিতে। এমনিতে সেরে যেতে পারে। আমেরিকায় থাকা আমাদের দু' ভাইয়ের মন সায় দিল না। দেশে অবস্থানকারী ভাইকে বললাম, আর ও দু' একজন ডাক্তারের মতামত নাও। তিনি সিলেট শহরের সর্বাধিক বয়োজৈষ্ঠ অর্থোপেডিক ডাক্তার রহুল আমিন সাহেব এবং ওসমানী মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান ডাক্তার পার্থ সোম *(বানান ভুল হলে দুঃখিত-লেখক)* বাবুর শরণাপন্ন হলেন। দু' জনেই গাফফার সাহেবের পুর্বেকার দেয়া পরামর্শের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন (আলাদা আলাদা ভাবে) এবং আশ্বস্ত করলেন -মায়ের বয়সের লোকদের ক্ষেত্রে এমন দুর্ঘটনা হর-হামেশাই ঘটে থাকে। কেবল ছোট একটি অপারেশন প্রয়োজন হবে। আমাদের ইচ্ছা ছিল- ইন্ডিয়াতে মাকে পাঠাব। সে চিন্তা বাদ দিলাম

ডাক্তারদ্বয়ের ভরসাতে। তবে আমি আমার ভাইকে বার বার সতর্ক করে দিলাম- তিনি যেন খেয়াল রাখেন, ডায়বেটিস কন্ট্রোল না করে কখনোই যেন অপারেশনে হাত দেয়া না হয়। আমার মাকে সিলেট শিশু হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হল, যেহেতু উক্ত হাসপাতালে আগে ও মায়ের গলব্লাডারের অপারেশন হয়েছিলো এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মোটামোটি পূর্ব-পরিচিত ছিলেন। ক্লিনিকে ভর্তি হওয়ার পরদিনই আমার মায়ের সার্জারীতে হাত দেয়া হলো। সার্জন ছিলেন ডাক্তার পার্থ সোম বাবু। বলা হলো , অপারেশন সাক্সেসফুল। খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। বিপদ টের পেতে শুরু করলাম পরক্ষণেই। ২৪ঘন্টা, ৪৮ ঘন্টা পার হয়ে গেলে ও মায়ের আর হুঁশ ফেরে না। ভয়ানক চিন্তায় পড়লাম। বর্ণনা শুনে মনে হলো- মা কোমা পর্যায়ে আছেন। একবার কেবল চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন। এই অবস্থায় মাকে ঢাকায় নেয়ার ব্যবস্থা করা হল। দুঃখের ব্যাপার- সমস্ত সিলেট শহর চষে বেড়িয়ে ও একটা এয়ারকন্ডিশন্ড এম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। আরো তামাশার ব্যাপার- ডাক্তার বললেন, অবস্থা তেমন সিরিয়াস নয়। যা হোক। অবশেষে বাইরে 'এম্বুলেন্স' লেখা এবং ভিতরে রোগিকে কোনমতে শোয়ানো যায়, এমন একটি গাড়িতে করে আমার মৃতপ্রায় মাকে নিয়ে আমার ভাই, ভাতিজা এবং অন্যান্য আত্নীয়-স্বজন ঢাকার উদ্দেশ্যে মধ্যরাতে রওয়ানা হলেন। এখানে নিউ ইয়র্কে আমার, আমার ভাই-ভাবী ও ভাতিজা-ভাতিজিদের ঘুম হারাম দুঃশ্চিন্তায় । এই বুঝি ভয়ংকর কোন খবর শুনতে হয়! তা'ছাড়া আমি হচ্ছি আমার মায়ের সবচেয়ে ছোট ছেলে। সেল ফোনে সর্বদা যোগাযোগ রাখতে লাগলাম। প্রথমে ইচ্ছা ছিল- বারডেমে ভর্তি করানো। সেখানে সিট না পাওয়াতে ধানমন্ডির *ইবনে সিনা* ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো। টেষ্টে ধরা পড়ল- এর মাঝে মার হাল্কা স্ট্রোক হয়েছে । বারডেমের ডায়বেটিসের প্রফেসর ওমর ফারুক এবং রওশান আলী সাহেব নিয়মিত মাকে চেক-আপ করতে যেতেন। পঙ্গু হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার এসে সার্জারীর স্থান ও দেখলেন । **সবাই একই মতামত ব্যক্ত করলেনঃ সার্জারীতে টেকনিক্যাল কোন ভুল নেই। তবে মারাত্নক ভুল হয়েছে যেটি, তা হচ্ছে- ডায়বেটিস কন্ট্রোল না করে একজন ষাটোর্ধ বয়স্ক রোগির ক্ষেত্রে সার্জারীতে হাত দেয়া ।**

আমার প্রশ্নঃ আমরা যারা ডাক্তার নই, তারা ও এই সামান্য ব্যাপারটি জানি যে, ডায়বেটিস রোগীদের ঘা শুকানোর সমস্যা, চোখের সমস্যা, স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা সহ বহু সমস্যা থাকাতে কখনোই সুগার লেবেল কন্ট্রোল না করে অপারেশনে হাত দেয়া ঠিক নয়। এখানে আমার এক বন্ধুর পরিচিত বাংগালী ডায়বেটিসের রোগীকে এলমার্স্ট হাসপাতালে একমাস ধরে সুগার কন্ট্রোল করে সার্জারীতে হাত দেয়া হয়। এই কমনসেন্স ভিত্তিক সাদামাটা ব্যাপারটি সিলেটের শিশু ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ এবং ডাক্তার মহোদয় কেন অনুধাবন করতে পারলেন না? নাকি, নগদ টাকার হাতছানি তাঁদেরকে মানুষের সেবকের অবস্থান থেকে অন্য কোন অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিলো? তাড়াতাড়ি অপারেশন মানে তাড়াতাড়ি টাকা? তাতে রোগীর প্রাণ গেলে ও যাক!

মাঝ খানে খানিকটা হুঁশ ফিরে এলে ও হঠাৎ করে আমার মায়ের অবস্থার অবনতি হতে লাগলো। পরদিন জানা গেল- এরই মাঝে ইউরিনারি ইনফেকশন ধরা পড়েছে। কোন এন্টিবায়োটিকে কাজ হচ্ছে না। প্রফেসর রওশন আলী সাহেব আশা হারালেন না। সবশেষে আরেকটি এন্টিবায়োটিক চেষ্টা করলেন। ফল ও পাওয়া গেল। পরদিন পরিষ্কার কন্ঠে মা আমাদের সকলের সাথে টেলিফোনে কথা বললেন। বর্তমানে আমার মা সিলেটে আছেন এবং আগের চাইতে ভালো আছেন। বলতে ভুলে গেছি- *ইবনে সিনাতে* মাকে প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট ডাঃ দীন মুহম্মদ সাহেব ও একবার দেখে গিয়েছেন।

এবার সংক্ষেপে আরো কয়েকটি ঘটনা, যে গুলোতে আমি নিজে আদ্যন্ত যুক্ত ছিলাম।

২০০০ সাল। তখন ও আমার আমেরিকা আসা হয়নি। আমেরিকা প্রবাসী এক কাজিন তাঁর প্রথম ছেলের মুখ দেখতে দেশে এলেন। এ সময় তাঁর এক হজ্ব ফেরত চাচা শ্বশুরকে রিসিভ করতে দুই শ্যালক, মামা শ্বশুরকে নিয়ে সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় তাঁদের গাড়ি আরেকটি বিপরীতমুখী গাড়ির সাথে অতি মারাত্নক মুখোমুখি সংঘর্ষে পতিত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়- সাত-আট বছর বয়সী তাঁর এক শ্যালক (মামা শ্বশুরের একমাত্র ছেলে) দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় *(সে ছেলেটির লাশের ফুটফুটে ও নিষ্পাপ চেহারা আজ ও আমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়ে গেছে- লেখক)*/ আমার কাজিনসহ বাকীরা মারত্নক ভাবে জখম প্রাপ্ত হলেন। খবর পেয়ে ছুটলাম ওসমানী হাসপাতালে। কি যে করুণ অবস্থা সেবার! একদিকে হাত পায়ের হাড্ডি ভাংগায় আহত স্বজনদের আর্তনাদ ধ্বনি, অন্যদিকে হাসপাতালে নেই কোন পরটেবল (বহনযোগ্য) এক্সরে মেশিন। কোন এক ক্লিনিক থেকে আনা হলো অবশেষে। এক্সরে করা হল। ঔষধ কিনতে হল হাসপাতালের বাহির থেকে। অবাক কান্ড! একেক ঔষধের দোকানে একেক রকম দাম! শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শে সবাইকে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হল। আবার ও ডাক্তার গাফফার। আবার সেই একই রকম এক্সরে করতে হল। বারবার। আমি কারণ জানতে চাইলে পিটপিট চোখে ডাক্তার মহাশয়ের এক রকম ধমকই খেতে হলো। যা হোক। অপারেশন করলেন তিনি। কিছুদিন পর বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হল রোগীদের। ক্রাচে ভর করে হাঁটতে গিয়ে কাজিন একদিন আবার পা ভেঙ্গে ফেললেন। এবার ঢাকাতে নামকরা পঙ্গু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার রুহল কুদ্দুস এর শ্যামলীর ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম। রোগী ভর্তি হলো। আবারো এক্সরে হলো। '*স্যারে*'র দেখা দিনে এক নজর মাত্র, কয়েক সেকেন্ডের জন্য। বেশী প্রশ্ন করা আবার বিপদজনক। সেদিন মনে হলো- আমাদের দেশের যে সমস্ত ডাক্তার একবার বিলেতে গিয়ে কোন মতে এফ.আর.সি.এস/এফ.আর.সি.পি. ডিগ্রী নিয়ে আসেন, তাঁদের অধিকাংশ বোধ হয় নিজেদের ভাইসরয় , বা লাট সাহেব জাতীয় কিছু ভাবেন *(ব্যতিক্রম অবশ্যি আছেন- লেখক)*/

আমার কাজিনের কপাল ভাল। তিনি আমেরিকান গ্রীন কার্ড হোলডার ছিলেন। আমারিকাতে আসা মাত্র তাঁর নতুন করে অপারেশন হয়। কয়েক সপ্তাহের মাথায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মত চলা ফেরা করতে সক্ষম হন। তাঁর মাম শ্বশুরটি আজো ক্রাচ নিয়ে চলাফেরা করেন। একমাত্র সু- সংবাদ- তিনি আবারো আরেকটি পুত্র সন্তানের জনক হয়েছেন।

আমার নিজের ভাবির হার্টের প্রবলেম ছিল। ঢাকাতে কার্ডিওলজিস্টদের অনেককে দেখানো হলো। ব্রিগেডিয়ার ডাঃ মালিক, পিজির প্রধান, এমন কি শিকদার মেডিক্যাল কলেজে ও নিয়ে গেলাম। মোটামোটি সবাই সাজেষ্ট করলেন একই বিষয়ঃ হার্টে জন্মগত ছিদ্র আছে এবং আপারেশন লাগবে। ঢাকাতে অপারেশনে মন সায় দিল না। ২০০১ সালের প্রথম দিকে ইন্ডিয়ার ব্যঙ্গালোরে ভাবিকে নিয়ে গেলাম হার্টের চিকিৎসার জন্যে। স্থান- ব্যঙ্গালোর শহরের অদূরে *মনিপাল হার্ট ফাউন্ডেশন*। ডাক্তার প্রখ্যাত হার্ট সার্জন দেবী শেঠী। সেবার দেখেছিলাম- সত্যিকার হাসপাতাল কাকে বলে, আর সত্যিকার ডাক্তার কারা। বহু বাঙ্গালীর দেখা পেলাম। অনেকে লন্ডন থেকে পর্য ন্ত এসেছেন। দেবী

শেঠীর সাথে আমি, আমার ভাই ও ভাবি দেখা করেছিলাম (তিনি প্রত্যেকটি রোগীর সাথে অপারেশনের আগে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করে সমস্ত প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দেন)। হার্টের অসুখ বিষয়ক ব্যাপার ছাড়া ও তিনি আমার অনেকগুলি ব্যক্তিগত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেন। সৌম্য দর্শন, সদা হাস্যময় ও ঋজু ভংগীর এ মানুষটির মুখের কথা শুনলেই অর্ধেক রোগ পালিয়ে যায় বলে আমার ধারণা। আমারিকাতে আসার পর ও তাঁর সাথে আমার কিছুদিন যোগাযোগ ছিল।

সিলেটে আবার ও ফিরে যাই। হার্টের সমস্যা সমাধান হলে ও আমার ভাবির গাইনী জাতীয় সমস্যা ছিল। স্থানীয় ডাক্তাররা* বার বার এন্টিবায়োটিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভাবি যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন বছরের পর বছর। অবশেষে কলকাতায় পিয়ারলেস হাসপাতালের প্রফেসর বিমল ঘোষের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। কেস হিস্ট্রি শুনে তিনি বললেন- ছোট একটা সার্জারী লাগবে। সার্জারী করা হল , এবং পরদিন ভাবিকে ছেড়ে দেয়া হল। ডাক্তার ঘোষ আসার সময় ঘোষণা দিলেন- আর কোন দিন এ সমস্যার জন্য আসতে হবে না।

লেখার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে কয়েকটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছি আমাদের দেশে রোগিদের চিকিৎসার বেলায়, এর কয়েকটি হচ্ছেঃ

- এক ডাক্তারের রেফার করা ডায়গোনেস্টিক টেস্টের রিপোর্ট অন্য ডাক্তারের কাছে গ্রহনযোগ্য হয় না। রোগিকে বার বার একই টেস্ট করাতে হয়। ডাক্তারগণ তাঁদের চয়েস মত সেন্টারে রোগিকে আবারো টেস্টের জন্য পাঠিয়ে দেন ভাল রেজালটের নাম করে। আসল সত্য হচ্ছে- তাঁরা ডায়গোনেস্টিক সেন্টার গুলো থেকে বিরাট মাপের কমিশন পান। গরীব রোগীর এতে বাজে বারোটা!
- সন্ধানী ছাড়া প্রফেশনাল ব্লাড ব্যাংক গুলো থেকে ব্লাড কেনা মানে হচ্ছে বিশাল রিস্ক নেয়া। কারণ- এ গুলোর বলতে গেলে কোনটাতেই টেষ্ট করা হয় না- ব্লাড হেপাটাইটিস, এইচ.আই.ভি, টিউবার কিউলোসিসের জার্ম মুক্ত কি-না। এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম প্রক্রিয়া, আমার মতে, হচ্ছে আত্নীয় স্বজনের মধ্যে একই ব্লাড গ্রুপের কাউকে খুঁজে বের করা (অবশ্যই তাঁর ও রক্ত চেক করা উচিত), অথবা সন্ধানীতে ব্লাড এক্সচেঞ্জ করে সঠিকটি নিয়ে আসা।
- ডায়গোনেস্টিক টেস্ট দ্বারা কনফার্মড না হয়ে ডাক্তাররা এলোপাতাড়িভাবে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেন, যা সম্পূর্ণ অনুচিত।
- বেশীর ভাগ ডায়গোনেস্টিক সেন্টারে টেস্টের ফি চড়া, অথচ রেজালট প্রায়ই নির্ভরযোগ্য নয়। একই ইউরিন/ব্লাড সেম্পল একই টেস্টের জন্য একাধিক সেন্টারে পরীক্ষা করিয়ে বিরাট রকমের হেরফের যুক্ত রেজালট পাওয়ার বহু নজির রয়েছে আমাদের দেশে।
- অধিকাংশ ডাক্তাররা রোগীদের সাথে বিনয়, নম্রতার সাথে কথা বলতে জানেন না। বাংলাদেশে রোগীরা ডাক্তারকে ভয় পায়। মেডিকেল কলেজ/হাসপাতাল গুলোতে সাইকো-থেরাপিস্টের ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।
- যত্র তত্র ক্লিনিকের ব্যবসা ও ভুল চিকিৎসার ফলে ডাক্তার/ক্লিনিক/ডায়গোনেস্টিক সেন্টার গুলোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও রোগীর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এবার সহ-সিলেটবাসীদের উদ্দেশ্যে দুটি কথাঃ সিলেট বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী

এলাকা। সিলেটবাসীদের পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ, আলিশান বাড়ি, বাসায় বাসায় চকচকে দামী গাড়ির অভাব নেই। বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের বেশীর ভাগ সিলেটিরাই পাঠান। অথচ কষ্টার্জিত পরিশ্রমের টাকা পাঠানো (অনেক সময় অঢেল হিসেবে) স্বত্তে ও অসুস্থ স্বজনদের সুচিকিৎসার জন্য একটা নামকরা হাসপাতাল নেই। দেশে একবার পত্রিকার শিরোনাম ছিলোঃ *ওসমানী হাসপাতালে খাবার পানিতে কেঁচো!* আরেকবার- *সার্জন ভুল ক্রমে রোগীর পেটে কাঁচি রেখে দিয়েছেন!* আমদেরকে তাই বিদেশ থেকে অসুস্থ স্বজনদের জন্য চিকিৎসার টাকা পাঠিয়ে ও থাকতে হয় দুঃশ্চিন্তায়। সংবাদপত্রে দেখি- প্রায় প্রতিমাসে সিলেটে এক একটি সুপার মলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কিন্তু একটা আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগের খবর দেখি না কখনো। অথচ বিদেশে লেখাপড়া করছেন, কিংবা মেডিক্যাল সায়েন্স/ম্যানেজমেন্টে ডিগ্রি নিয়েছেন এমন সিলেটিদের সংখ্যা কম হলে ও একেবারে শূণ্য নয়। এটা কি আশা করা অনুচিৎ যে, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ হাসপাতালটি থাকার কথা ছিলো সিলেট অঞ্চলে? একটা *পিয়ারলেস,* কিংবা একটা *এপোলো* হাসপাতাল? নাকি পুরোনো দিনের গানটিকে উলটিয়ে মনকে শান্তনা দিব ঃ *সাধ্য মোদের দিলা প্রভু, সাধ মোদের দিলা না.....*

নিউ ইয়র্ক
২৭ জুলাই, ২০০৪

*গল্প চালু আছে- সিলেটে হিজাব পরা এবং সৌদীতে হজ্ব এবং চাকরি করা এক গাঈনি বিশেষজ্ঞ (?) মহিলা ডাক্তার আছেন, যাঁর ক্লিনিকে কোন প্রেগনেন্ট মহিলা ভর্তি হলেই *সিজারিয়ান* কবুল করে নিতে হয় !

কপিরাইটস ২০০৪ *মুক্তমনা (www.mukto-mona.com)*

বাংলা টাইপিং সফটওয়ার *www.bornosoft.com* এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।